সফল উদ্যোক্তাদের জীবনী থেকে শিক্ষণীয়

ইউনিট 12

ভূমিকা

স্মরণাতীতকাল থেকে আমাদের দেশ শিল্প বাণিজ্যে ঐতিহ্য ও গৌরব বহন করলেও দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে শিল্পের অবদান তেমন উজ্জ্বল নয়। স্বাধীনতার আগে মাত্র অল্প কয়েকজন বাঙালি ব্যবসায়ে সফলতা অর্জন করেন। মূলত ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের পর বাঙালিরা ব্যবসায়ের সুযোগ পান। বিগত কয়েক দশকে বেশ কয়েকজন উদ্যোক্তা ছোট ব্যবসায় দিয়ে শুরু করে দেশের শ্রেষ্ঠ ব্যবসায় উদ্যোক্তা হিসেবে পরিচিত হন এবং তাদের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায় দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। এ অধ্যায়ে দেশের দুই জন স্বনামধন্য শিল্প উদ্যোক্তা মরহুম জহুরুল ইসলাম ও মরহুম স্যামসন এইচ চৌধুরীসহ বেশ কয়েকজন উদ্যোক্তার জীবনী আলোচনা করা হলো যাদের জীবন ও কর্ম থেকে আমরা সকলেই অনুপ্রাণিত হতে পারব।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ - ১২.১ : কেস স্টাডির ধারণা
পাঠ - ১২.২ : সফল উদ্যোক্তাদের জীবনী-১
পাঠ - ১২.৩ : সফল উদ্যোক্তাদের জীবনী-২
পাঠ - ১২.৪ : সফল উদ্যোক্তাদের জীবনী-৩
পাঠ - ১২.৫ : সফল উদ্যোক্তাদের জীবনী-৪
পাঠ - ১২.৬ : সফল উদ্যোক্তাদের জীবনী-৫

পাঠ-১২.১ কেস স্টাডির ধারণা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- কেস স্টাডির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Key Words)	কেস স্টাডি

ব্যবসায় প্রশাসন শিক্ষা কার্যক্রমে শিক্ষা দানের মাধ্যম হিসাবে কেস স্টাডি পদ্ধতি বাধ্যতামূলকভাবে প্রথম শুরু হয় ১৯০৪ সালেযুক্তরাষ্ট্রের হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজনেস স্কুলে। কেস স্টাডি সচারচর আইন ও চিকিৎসাশাস্ত্রে অধিক ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ব্যবসায় প্রশাসনেও বর্তমানে এটি গুরুত্ব ও জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এ পদ্ধতির প্রবর্তনের ফলে শিক্ষার্থীরা বাস্তব সমস্যার সমাধানের মাধ্যমে ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পায় যা অন্য কোন মাধ্যমের দ্বারা সম্ভব নয়।

কেস স্টাডি: কেস হল কোন একটি ঘটনা, অবস্থা বা সমস্যার বর্ণনা বিশেষ। কিন্তু এটি এমন একটি অবস্থা, ঘটনা বা সমস্যার বর্ণনা প্রদান করে যা বাস্তবে একজন ব্যাক্তিকে মোকাবেলা করতে হয়েছে এবং যে বিষয়ে সে ব্যক্তিকে চিন্তা ভাবনা ও বিচার বিশ্লেষণ করে সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহন করতে হয়েছে। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে কেস দ্বারা ব্যাবসায় কাজ পরিচালনা করতে গিয়ে একজন উদ্যোক্তা বা ব্যবসায়কে যে পরিস্থিতি বা সমস্যার মোকাবিলা করতে হয়েছে এবং যে পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করছে এর সুসংবদ্ধ লিখিত বিবৃতিকেই বোঝায়। অর্থাৎ ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে বাস্তবে সংঘটিত ঘটনাবলী বা অবস্থাসমুহের লিখিত বিবরন বা প্রতিবেদনকে ব্যবসায় সংক্রান্ত কেস বলা হয়। কেস স্টাডি বা ঘটনা অধ্যায়ন অভিজ্ঞতার একটি বিকল্প বিশেষ। এ পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ব্যবসায়ের গতি প্রকৃতি, অভ্যন্তরীণ ব্যবসায়িক কার্যক্রম, বহিঃস্থ পরিবেশ প্রভৃতি সম্পর্কিত বিস্তারিত ধারণা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করা যায়। এক্ষেত্রে ঘটনার বিবরণ আকর্ষণীয় ও নিখুঁতভাবে উপস্থপন করা হয় বিধায় শিক্ষার্থীরা খুব সহজেই তা বুঝতে পারে। কেস স্টাডি বা কেস পর্যালোচনা বলতে সমস্যা আলোচনা পদ্ধতিকে বোঝায়। কেস স্টাডি এর মাধ্যমে একটি সমস্যার কথা তুলে ধরা হয়। অতঃপর দলবদ্ধভাবে আলোচনা করে সমস্যার কারণ ও সম্ভাব্য সমাধান খুঁজে বের করা হয়। কেসে বর্ণিত সমস্যাটি আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সম্পর্কে গভীর অনুভুতি লাভ করা যায়। এবং এর মাধ্যমে উন্নততর কার্যক্রমের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। এতে প্রকৃত শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জিত হয় এবং ব্যবসায়ে সফলতা আসে।

প্রামান্য সংজ্ঞা:

- পলিন ডি, ইয়ং-এর মতে, "কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সার্বিক অবস্থা বা নিয়মাবলি বিশদভাবে অনুসন্ধান ও বিশে□ষণ করার পদ্ধতি হল কেস স্টাডি।"
- অধ্যাপক লেটেনের মতে, "কেস পদ্ধতি কাজ করার মাধ্যমে শিক্ষালাভ করার সমতুল্য।" তার ভাষায়, কেস স্টাডি বা পর্যালোচনা পদ্ধতি অভিজ্ঞতার একটি বিকল্প উপায় যা স্বল্প সময়ে আয়ত্ব করা যায়। মুলত কেস স্টাডি বা পর্যালোচনা একটি সমবেত ও সমবায়মূলক প্রচেষ্টা যা আলোচনায় অংশগ্রহনকারীদের সৃজনশীল চিন্তার তীক্ষ্ণতা ও প্রসারতা বৃদ্ধি করে।

সুতরাং একজন উদ্যোক্তা বাস্তবে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হন এবং তা মেকাবিলায় যে পদক্ষেপ গ্রহন করেন তার লিখিত বিবরণকে কেস স্টাডি বলে।

পাঠ-১২.২ সফল উদ্যোক্তাদের জীবনী-১

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- সফল উদ্যোক্তাদের জীবনী-১ বিস্ড়রিতভাবে বর্ণনা করতে পারবেন

মরহুম জহুরুল ইসলাম এর জীবন ভিত্তিক কেস স্টাডি-

বাংলাদেশের অন্যতম সফল উদ্যোক্তা হচ্ছেন মরহুম জহুরুল ইসলাম। ব্যবসায় প্রতিভা, কঠোর পরিশ্রম, দুরদর্শিতা ও সৃজনশীলতার সমন্বয়ে গঠিত এ মানুষটি স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের ব্যবসায়-শিল্প-বাণিজ্য জগতে একটি অতি পরিচিত নাম। তিনি ১৯২৮ সালে কিশোরগঞ্জ জেলার বাজিতপুর উপজেলায় ভাগলপুর জন্ম গ্রহন করেন। তার পিতা মরহুম আলহাজ্ব অফতাব উদ্দীন ছিলেন ময়মনসিংহ জেলা বোর্ডের একজন সাধারণ কন্ট্রাক্টর। তার মাতার নাম বেগম রহিমা আক্তার খাতুন। পাঁচ ভাই তিন বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন দ্বিতীয়। তার চাচা ছিলেন কলকাতার পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের একজন ওভারশিয়ার।

স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে পঞ্চম শ্রেণির পড়া শেষ করে তিনি কিছুদিন সরারচর শিবনাথ উচ্চবিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। এরপর ভর্তি হন বাজিতপুর হাইস্কুলে। কিছুদিন পর তিনি চাচা মুর্শেদ উদ্দীনের সাথে চলে যান কলকাতায়। ১৯৪৫ সালে তিনি কলকাতার রিপন হাইস্কুল থেকে মেট্রিক পাশ করেন। ১৯৪৮ সালে তিনি মুন্সিগঞ্জের হরগঙ্গা কলেজ থেকে আই এ পরিক্ষায় অংশ গ্রহন করলেও উত্তীর্ণ হতে পারেননি। প্রতিকুল পরিবেশ ও পারিবারিক দায় দায়িত্বের চাপে তার আনুষ্ঠানিক পড়াশুনার সমাপ্তি ঘটে। পরিবারের আর্থিক সচ্ছলতার জন্য ১৯৪৮ সালে সি এন্ড বি ডিপার্টমেন্টের ওয়ার্ক সরকার পদে মাত্র সাতাত্তর টাকা বেতনের চাকরি নেন। তিনি কিছুদিন পর ঐ বিভাগে নিম্নমান সহকারী বা লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক পদ লাভ করেন। চাচার চাকরি ও পিতার কন্ট্রাক্টরি ব্যবসার প্রভাব তার জীবনের উপর পড়েছিল। আড়াই বছর পর ১৯৫১ সালে তিনি চাকরি ছেড়ে দেন এবং একজন তৃতীয় শ্রেণীর কন্ট্রাক্টর হিসাবে তালিকাভুক্ত হন। বেঙ্গল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড নামে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা করে তিন চার হাজার টাকার মতো সামান্য পুঁজি নিয়ে তিনি সম্পূর্ণভাবে ব্যবসায় শুরু করেন।কঠোর পরিশ্রম ও ব্যবসায়ের প্রতি একাগ্রতা ও আন্তরিকতা তাকে ধীরে ধীরে একজন সার্থক ব্যবসায় উদ্যোক্তা ও অন্যতম ধনাঢ্য ব্যাক্তি হিসাবে পরিনত করেন। ঠিকাদারী জীবনের শুরুতেই তিনি কিশোরগঞ্জ পোস্ট অফিস নির্মাণের কাজ করেন। পরে ঢাকার গুলিস্তান থেকে টিকাটুলি সড়কের কাজ। কাজের সততা ও গুণগতমানের কারণে দুই বছরের মধ্যেই ১৯৫৩ সালে তিনি পর্যায়ক্রমে দ্বিতীয় ও প্রথম শ্রেণীর কন্ট্রাক্টর বা ঠিকাদার হিসাবে পরিণত হন। সব ধরনের র্নিমান কাজে আগ্রহ ছিল। বাড়ি, রাস্ত, ব্রিজ, সেচ ব্যবস্থা, স্যানিটেশন সব কিছুতেই তিনি বিনিয়োগ করেছিলেন। কাজের মাধ্যমে তিনি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতেন তা পরর্বতী কাজে ব্যবহার করতেন। তিনি দূরদর্শিতা দিয়ে বুঝতে পারলেন ঢাকার আশেপাশে এক সময় বসতি বাড়বে এবং একই সঙ্গে বাড়বে জমির চাহিদা। তাই তিনি ঢাকা শহরে বিভিন্ন স্থানে এবং মিরপুর, সাভার জয়দেবপুর, কালিয়াকৈর অঞ্চলে বিপুল পরিমাণ জমি ক্রয় করেন। সে জমিগুলোতে তিনি শিল্প স্থাপন এবং আবাসিক গৃহ নির্মাণের কাজে লাগান। দিনে দিনে জমির দাম বাড়ার কারণে জহুরুল ইসলামের বিনিয়োগকৃত মূলধনের মূল্যও বাড়তে থাকে। তিনি ১৯৬০ সালের দিকে একটি টিম্বার কারখানা ও ঢাকার জিঞ্জিরায় একটি গ্যাস কারখানা স্থাপন করেন। ঢাকা শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে মানুষের আবাসন চাহিদা মেটাতে ১৯৬৪ সালে ইস্টার্ণ হাউজিং লিমিটেড নামে একটি সহ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন যা বর্তমানে বাংলাদেশের আবাসন খাতের অন্যতম প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে তার প্রতিষ্ঠিত সকল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ইসলাম গ্রুপ অব কোম্পানীজ নামে পরিচিত যা ১৯৬৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর আওতায় রয়েছে ইস্টার্ন হাউজিং লিঃ নাভানা লিঃ মিলনার্স লিঃ এসোনশিয়াল প্রোডাক্স লিঃ, ঢাকা ফাইবার্স লিঃ, ক্রিকেট ইন্টারন্যাশনাল লিঃ, নাভানা স্পোর্টস লিঃ ঢাকা রি-রোলিং মিলস লিঃ আফতাব অটোমোবাইল্স লিঃ

আফতাব ডেইরী ফার্ম ইত্যাদি। তাঁর প্রতিষ্ঠিত শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় লক্ষাধিক মানুষ নিয়োজিত আছে।

পরিশ্রম, সততা, নিষ্ঠা, এবং আত্মবিশ্বাস তাকে সফল মানুষে পরিণত করেছিল। এই অসাধারণ বাঙালী কৃতি সন্তান শুধু শিল্পপতি পরিচয়ে সীমাবদ্ধ থাকেননি। একজন সমাজ সংস্কারক, সফল সংগঠক, ব্যবস্থাপকের মডেল তিনি। তার সব অর্জনই সম্ভব হয়েছে কঠোর শ্রম ও আন্তরিকতায়। শুধু বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানেই নয়, সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে তার জনহিতকর হাত প্রসারিত হয়েছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য, ব্যাংকিং,কৃষি, ক্রীড়াসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে। তিনি বহু অনাথ আশ্রম, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মাদ্‌রাসা ও স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। তার উদ্যোগে বাজিতপুরের স্থাপিত ৩৫০ শয্যার জহুরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালটি বেসরকারি উদ্যোগে স্থাপিত দেশের সর্বকৃহৎ মেডিকেল কলেজ। তাছাড়া নার্সিং ট্রেনিং ইনিষ্টিটিউট ও জহুরুল ইসলাম এডুকেশন কমপ্লেক্স তার অন্যতম কীর্তি। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধেও তিনি নানাভাবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। ১৯৯৫ সালের অক্টোবর এই কর্মবীরের জীবনাবসান হয়।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**

সফল ব্যবসায় উদ্যোক্তা মরহুম জহুরুল ইসলামের জীবনের যে দিকগুলো আপনাকে আকৃষ্ট করেছে তা চিহ্নিত করুন এবং আপনার মধ্যে সে গুণগুলো কীভাবে চর্চা করবেন তা ব্যক্ত করুন।

সফল উদ্যোক্তা জনাব জহুরুল ইসলামের বিশেষ গুণাবলি	নিজের জীবনে চর্চা করার উপায়
•	•
•	•
•	•

সারসংক্ষেপ

মরহুম জহুরুল ইসলাম একজন সফল উদ্যোক্তা। পরিশ্রম সততা, নিষ্ঠা এবং আত্মবিশ্বাস তাকে সফল মানুষে পরিণত করেছিল তার সব অর্জনই সম্ভব হয়েছে কঠোর শ্রম ও আন্তরিকতার।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. জহরুল ইসলামের পিতা ছিলেন একজন-
   ক) কৃষক খ) শিল্পপতি
   গ) ক্ষুদ্র ঠিকাদার ঘ) শ্রমিক

২. জহরুল ইসলাম জন্ম গ্রহণ করেন-
   ক) ১৯১৮ সালে খ) ১৯২৮ সালে
   গ) ১৯৪২ সালে ঘ) ১৯৪৭ সালে

৩. কী ধরনের গুণাবলী থাকলে একজন উদ্যোক্তাকে আদর্শ উদ্যোক্তা বলা যায়?
   ক) ব্যক্তিগত মনস্তাত্ত্বিক খ) সামাজিক ও অর্থনেতিক
   গ) ব্যক্তিগত অর্থনেতিক ও সামাজিক

   নিচের কোনটি সঠিকঃ
   (ক) i খ) ii, iii (গ) iii (ঘ) i ও ii

৪. একজন সফল উদ্যোক্তা হিসাবে জহরুল ইসলামের মধ্যে নিচের কোন গুণটি ছিল?

i) ব্যবসায়ের অসাধারন আগ্রহ ও প্রতিভা

ii) নিত্যনতুন প্রকল্পে কাজ করায় আগ্রহ ও সাহস

iii) কঠোর পরিশ্রম ও একাগ্রতা

নিচের কোনটি সঠিকঃ

(ক) i খ) ii (গ) iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দিন:

অত্যাধুনিক চিন্তা, চেতনা ও মননশিলতা অধিকারি হিসাবে বাংলাদেশের উদ্যোক্তাদের মধ্যে যার নাম সর্বাগ্রে তিনি হলেন শিল্পপতি মরহুম জহরুল ইসলাম। বলা যায় তিনি একজন ক্যারিজমেটিক উদ্যোক্তা। বাংলাদেশে বেসরকারী মালিকানায় এমন কোন শিল্প খাত নেই যেখানে জহরুল ইসলামের পদচারণা খুজে পাওয়া যায় না।

৫. শিল্প জগতে জহরুল ইসলামের পদার্পণ নিচের কোনটি দিয়ে ?

ক) দিয়েশলাই কারখানা খ) টিমবার কারখানা

গ) ডক ইয়ার্ড ঘ) ব্যাংকিং

৬। জহরুল ইসলামের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান নয় কোনটি ?

ক) বেঙ্গল রিভার সার্ভিস লিঃ খ) এসেনসিয়াল প্রোডাকটস লিঃ

ঘ) ঢাকা রিবোলিং মিলস্ লিঃ ঘ) মিলানারস লিঃ

পাঠ-১২.৩ সফল উদ্যোক্তাদের জীবনী-২

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- সফল উদ্যোক্তাদের জীবনী-২ বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করতে পারবেন

স্যামসন এইচ চৌধুরী (১৯৩০-২০১২)

বাংলাদেশের শিল্প-বাণিজ্যের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় নাম স্কয়ার গ্রুপের চেয়ারম্যান, জনহিতৈষী ব্যক্তিত্ব স্যামসন এইচ চৌধুরী। তার জন্ম ১৯৩০ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর ফরিদপুর জেলায়। পিতা ই এইচ চৌধুরী ও মাতা লতিফা চৌধুরী। স্যামসন চৌধুরীর পিতা ছিলেন আউটডোর ডিসপেনসারির মেডিকেল অফিসার। তিনি ১৯৩০-৪০ সাল পর্যন্ত কলকাতার বিষ্ণপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়শুনা করেন। সেখান থেকে তিনি সিনিয়র কেমব্রিজ ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর তিনি হাভার্ড ইউনিভার্সিটি স্কুল থেকে ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ডিপ্লোমা ডিগ্রি অর্জন করেন। শিক্ষাজীবন শেষে তিনি ফিরে আসেন পাবনার আতাইকুলা গ্রামে। পিতার পেশার কারণে ছোটবেলা থেকেই তিনি ঔষধ নিয়ে নাড়াচাড়া করতেন। অনেক ছোট চিন্তা-ভাবনা করে তিনি ফার্মেসী বা ঔষধের দোকানকেই ব্যবসা হিসাবে গ্রহণ করেন। গ্রামের বাজারে দিলেন ছোট্ট একটি দোকান। সময়টি ছিল ১৯৫২ সাল। ১৯৫৮ সালে তিনি ঔষধ কারখানা স্থাপনের একটি লাইসেন্স পান। তিনিসহ আরো চার বন্ধু মিলে প্রত্যেকের ২০,০০০ টাকা করে মোট ৮০.০০০ টাকায় ১২ জন শ্রমিক নিয়ে স্থাপন করেন স্কয়ার ফার্মসিউটিক্যালস। এ কারখানায় প্রথম ঔষধটি তৈরী হয় তা ছিল রক্ত পরিশোধনের 'এস্টন সিরাপ'। দেশীয় আমদানীকারকদের কাছ থেকে চড়া দামে কাঁচা মাল কিনে তৈরী করতে হতো এ ঔষধ। গুণগতমানের সাথে আপোস করা হয়নি কখনো। গুনগত মানের কারণেই প্রেসক্রিপশনে এ ঔষধের নাম উল্লেখ করতেন স্থানীয় ডাক্তারগণ। এক পর্যায়ে নামকরা কোম্পানির ঔষধের চেয়েও বেশী চলতে থাকে স্কয়ারের এ ঔষধ। তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন স্কয়ার একদিন অনেক বড় হবে। এ স্বপ্ন বুকে নিয়ে অফুরন্ত উদ্যম ও সাহসিকতাকে পুঁজি করে সামনের সব প্রতিকুলতাকে মোকাবেলা করে ধীরে ধীরে এগিয়েছেন তিনি। কঠোর পরিশ্রম, সততা ও শৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে সেই ছোট উদ্যোগ আজ বিশাল স্কয়ার গ্রুপ অব ইন্ডস্ট্রিতে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে সেখানে প্রায় ৩০,০০০ শ্রমিক কর্মরত। শুধু ঔষধ শিল্প নয়, এ গ্রুপের ব্যবসায় সম্প্রসারিত হয়েছে প্রসাধন সমাগ্রী, টেক্সটাইল, কৃষিপন্য, তথ্যপ্রযুক্তি, স্বাস্থ্যসেবা ও মিডিয়ায়। বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে স্কয়ারের পণ্য। ঔষধের গুণগতমান দেশে বিদেশে স্বীকৃত। পৃথিবীর ৫০টি দেশে রপ্তানী হচ্ছে স্কয়ারের ঔষধ। দেশের অন্যতম বেসরকারী টিলিভিশন চ্যানেল মাছরাঙ্গা টেলিভিশনের তিনি ছিলেন চেয়ারম্যান। তাছাড়া তিনি মেট্রোপলিটন চেম্বার ঔষধ শিল্প সমিতির সভাপতি ছিলেন। যুক্ত ছিলেন ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার এন্ড কর্মাস বাংলাদেশের সাথে। স্যামসন এইচ চৌধুরী সম্পর্কে শোভা অধিকারী লিখেছেন, একাধারে তিনি ছিলেন মালিক- ম্যানেজার, হিসাবরক্ষক, টাইপিস্ট, কেরানী, শ্রমিক ও মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ। উপর থেকে নিজ পর্যন্ত এমন কোন কাজ নেই যা তাকে করতে হয়নি।এ দেশের প্রায় সবকটি শহর, বন্দর, ও গঞ্জে স্কয়ারের তৈরী ঔষধ বাজারজাতকরণের উদ্যেশ্যে নিরলসভাবে ঘুরছেন। বহু চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে স্কয়ার এখন বাংলাদেশে একটি গর্বিত নাম। ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে স্কয়ার গ্রুপ বছরের সেরা করদাতা হিসেবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নির্বাচিত হয়েছিল। স্কয়ারের তৈরী হরেক রকম পণ্য আজ মানুষের ঘরে ঘরে। মান, প্রতিযোগিতামূলক মূল্য, গুণগতমানও কাজের শৃঙ্খলার কারণে দেশে বিদেশে স্কয়ারের সব পণ্য সমাদৃত। শিল্প সৃষ্টির নেশা স্যামসন চৌধুরীকে পৌঁছে দিয়েছে সফল শিল্পপতি ও সার্থক উদ্যোক্তার কাতারে। নিরলস প্রচেষ্টা ও উদ্যোমে তিনি একের পর এক গড়ে তুলেছেন নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে স্কয়ার গ্রুপের বিভন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস, স্কয়ার টয়লেট্রিজ, স্কয়ার টেক্সটাইল,স্কয়ার হারবাল এন্ড ন্যাচারালস, স্কয়ার হাসপাতাল লিমিটেড। বিভিন্ন সময়ে গণমাধ্যমে দেওয়া সাক্ষাতকারে এ শিল্পোদ্যোক্তা তাঁর সাফল্যের ভিত্তি হিসেবে ধৈর্য, অধ্যবসায় ও সততাকেই মূল হিসেবে উল্লেখ করেছেন।প্রতিটি স্তরে সর্বোচ্চ মূল্যবোধ ও নৈতিকতার চর্চাই স্কয়ারকে মানুষের আস্থার

আসনে বসিয়েছে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। সর্বদাই আশাবাদী এ উদ্যোক্তা মালিক ও শ্রমিকের যৌথ প্রয়াসকেই ব্যবসায়ে সাফল্যের চাবিকাঠি হিসেবে মনে করতেন। শ্রমিকবান্ধব এ শিল্পপতির কারখানায় কখনো শ্রমিক অসন্তোষ দেখা যায়নি। ২০১২ সালের ৫ জানুয়ারী ৮৬ বয়সে এ কীর্তিমানের জীবনাবসান হয়। তাঁর স্ত্রীর নাম অনিকা চৌধুরী। তার তিন ছেলে তপন চৌধুরী, অঞ্জন চৌধুরী, স্বপন চৌধুরী ব্যবসায়ী হিসেবে স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত।

পুরস্কার ও স্বীকৃতি দেশের বেসরকারী খাতে শিল্প স্থাপন, পণ্য উৎপাদন, কর্মসংস্থান সৃষ্টিও জাতীয় আয় বৃদ্ধি ও জাতীয় আয় বৃদ্ধিসহ সামগ্রিকভাবে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখার জন্য ২০১০ সালে সরকার ৪২ জন ব্যক্তিকে বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাক্তি (Commercially Important Person-CIP) নির্বাচন করে। তন্মধ্যে বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠীর ১৮ জনের মধ্যে একজন ছিলেন স্যামসন এইচ চৌধুরী। তিনি ২০০০ সালে দৈনিক ডেইলি স্টার ও ডি এইচ এল প্রদত্ত বিজনেস ম্যান অব দি ইয়ার এবং ১৯৯৮ সালে আমেরিকান চেম্বার অব কমার্সের দৃষ্টিতে 'বিজনেস এক্সিকিউটিভ অব দি ইয়ার' নির্বাচিত হয়েছিলেন।

সারসংক্ষেপ

একজন সফল উদ্যোক্তা হিসাবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য তিনি যে নিদর্শন রেখে গেছেন তা প্রশংসার দাবিদার। তাঁর আত্মজীবনীতে তিনি বলে গেছেন একজন উদ্যোক্তাকে সফলকাম হতে হলে প্রবল আত্মবিশ্বাস, সততা, নিষ্ঠা ও কর্তব্য পরায়ন হতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. কোন জেলায় স্যামসন এইচ চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন?
ক) নরসিংদী জেলা খ) পাবনা জেলা
গ) ফরিদপুর জেলা ঘ) টাঙ্গাইল জেলা

২. স্যামসন এইচ চৌধুরী কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?
ক) ১৯৩০ খ) ১৯২৬
গ) ১৯২৮ ঘ) ১৯৩৫

৩। কী ধরণের গুণাবলী থাকলে একজন উদ্যোক্তাকে আদর্শ উদ্যোক্তা বলা যায়।
i) ব্যক্তিগত ও মনস্তাত্ত্বিক ii) সামাজিক ও অর্থনৈতিক
iii) ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক ও সামাজিক
নীচের কোন্‌টি সঠিক?
(ক) i খ) ii (গ) iii (ঘ) i, ii ও iii

৪। একজন সফল উদ্যোক্তা হিসাবে স্যামসন এইচ চৌধূরীর মধ্যে কোন্ গুণটি ছিল?
i) নিরলস প্রচেষ্টা ও উদ্দোম
ii) ব্যবসায়ের অসাধারণ আগ্রহ ও প্রতিভা
iii) কঠোর পরিশ্রম ও একাগ্রতা
নীচের কোন্‌টি সঠিক?
(ক) i খ) ii (গ) iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১২.৪ সফল উদ্যোক্তাদের জীবনী-৩

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- সফল উদ্যোক্তাদের জীবনী-৩ সম্পর্কে বলতে পারবেন।

এ. কে. খান-এর জীবন ভিত্তিক কেস স্টাডি

জন্ম পরিচয় : ১৯০৫ সালে চট্রগ্রামস্থ চাঁটগাও মোহরা গ্রামে এ.কে খান জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম জনাব আব্দুল লতিফ খান। আব্দুল লতিফ খান স্বল্প বেতনের সরকারী সাব রেজিস্টার হওয়া সত্তেও অতি কষ্টে ছেলের লেখা পড়ার ব্যয়ভার বহন করতে থাকেন।

শিক্ষাজীবন : এ. কে খান ফতোয়াবাদ হাই স্কুল থেকে ১ম, বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। চট্রগ্রাম সরকারি কলেজ হতে ১ম বিভাগে আই এ পাস করেন। পরবর্তীতে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি এ অনার্স এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণিতে এম এ পাস করেন।

চাকরী জীবন : জনাব খান শিক্ষাজীবন শেষ করে কলকাতা হাইকোর্টে আইন পেশায় যোগ দেন। প্রথম অবস্থায় তিনি শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের সহকারী হিসেবে কাজ শুরু করেন। ১৯৩৫ সালে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় পাস করে মুন্সেফ হিসেবে বিচার বিভাগে যোগ দেন। ত্রিশের দশকের মাঝামাঝি সময়ের বিশ্বের অর্থনৈতিক মন্দা এবং মুসলিম পরিবারের সন্তান হয়েও সরকারী চাকরি লাভ করা তাঁর জন্য কম গৌরবের বিষয় ছিল না। ১৯৪৪ সালে চাকরি ত্যাগ করে এ কে খান স্বাধীন পেশায় আত্মনিয়োগ করেন।

ব্যবসায়িক জীবন : এ কে খান ব্যবসায়ে আসার পেছনে গুরুত্বপুর্ণ ভুমিকা পালন করেন তাঁর শ্বশুর আব্দুল বারী চৌধুরী। তিনি ছিলেন তৎকালীন সময়ের নাম করা বেঙ্গল বার্মা নেভিগেশন কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আব্দুল বারী চৌধুরী রেঙ্গুনে সকল ব্যবসায়ীক সম্পত্তি ফেলে রেখে মাত্র কয়েক লাখ টাকা নিয়ে চলে আসেন। যা তিনি জামাতা এ কে খানকে মূলধন স্বরুপ প্রদান করেন। মুলত: শ্বশুরই তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেন।

১৯৫১ সালে মাত্র ৪ লাখ টাকা মূলধন খাটিয়ে সম্পূর্ণ দেশীয় কাঁচামালের ওপর ভিত্তি করে কালুরঘাটে দিয়াশলাই কারখানা স্থাপন করেন। ১৯৫২ সালে কালুরঘাট এলাকায় প্রতিষ্ঠা করেন এ. কে খান প্লাইউড কোম্পানি লিমিটেড। এ দুটি ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান হতে তিনি বৃহৎ কিছু করার চিন্তা করেন। যার বাস্তবায়নে ঘটে ১৯৫৪ সালের চিটাগাং টেক্সটাইল মিলস লিঃ- এর উৎপাদন শুর“র মাধ্যমে। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন দ্রুত শিল্পায়নের মাধ্যমে যদি সমাজকে পরিবর্তন করতে হয়, তাহলে পুঁজির সাথে আধুনিক প্রযুক্তির মিলন এবং প্রয়োজনে বিদেশের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। পরবর্তীতে তিনি এ.কে. লেদার এন্ড সিনথেটিকস লিমিটেড, এ. কে. খান জুটস মিলস লিঃ এ. কে. ডকিন ইঞ্জিনিয়ারিং লিঃ খান এলিন কর্পোরেশন লিঃ, বঙ্গাতরী শিপিং কোম্পানি লিঃ, এ. কে. নিটওয়ার, এ. কে. গার্মেনটস প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন।

এ. কে. খান ছিলেন একজন দক্ষ শিল্পোদ্যোক্তা। তাঁর মতে দুরে বসে শিল্প কারখানা ব্যবস্থাপনা করা সম্ভব নয়। তিনি মনে করেন উৎপাদনের দিকটিই হল গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিতেন মালিক-শ্রমিক সহযোগিতা ও সম্প্রীতির প্রতি।

এ. কে. খান তৎকালীন সময়ে মুসলিম লীগের জেলা সভাপতি ছিলেন এবং জাতীয় পরিষদের সদস্যও নির্বাচিত হন। যার সুবাদে তিনি ১৯৫৮ সাল থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের শিল্পমন্ত্রীর দাযিত্ব পালন করেন। এসময় তিনি বাঙ্গালি উদ্যোক্তাদের সাহায্যে করার জন্য P.I.D.C - কে বিভক্ত করে EPIDC ও WPIDC নামে দুটি পৃথক সংস্থা গঠন করেন। তিনি যখন মন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহন করেন, তখন এদেশে বাঙগালি মালিকাধীন জুট মিলের সংখ্যা ছিল একটি। তাঁর একান্ত

প্রচেষ্টায় পরবর্তীতে এ সংখ্যা দাঁড়ায় তিরিশে। তৎকালিন সময়ে তাঁরই প্রচেষ্টায় ও সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হয় বাঙগালি মালিকানায় একমাত্র ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান 'ইস্টার্ণ মার্কেন্টাইল ব্যাংক' যার বর্তমান নাম পূবালী ব্যাংক।

সেবামূলক প্রতিষ্ঠানসমুহ ঃ বহু সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত ছিলেন এ. কে. খান। জাতীয় জনকল্যাণ সমিতির চট্রগ্রাম শাখার সভাপতি ছিলেন তিনি। পাহাড়তলীতে চট্রগ্রাম চক্ষু কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠা করেন। স্বাস্থ্য শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠা করেন এ. কে. খান ফাউন্ডেশন। চট্রগ্রাম চারুকলা কলেজ, শিশু হাসপাতাল ও আর্ট গ্যালারী স্থাপনে তিনি আর্থিক সাহায্য প্রদান করেন। মৃত্যুর পুর্বে তিনি তাঁর শিল্প প্রতিষ্ঠানের লভ্যাংশের ৩০ ভাগ ধর্ম. স্বাস্থ্য ও শিক্ষার জন্য ওয়াকফ করে গেছেন।

সারসংক্ষেপ

একজন শিল্পোদ্যোক্তা হিসেবে এ. কে. খানের চরিত্রের যে গুণগুলো ছিল তার মধ্যে সৎ, ন্যায়নিষ্ঠা, রুচিবোধসম্পন্ন ভবিষ্যত দেখার এবং প্রয়োজনে ঝুঁকি গ্রহণ করার দূর্জয় স্পৃহা অন্যতম। এসব গুণাবলির কারণে হতাশা তাকে কখনও গ্রাস করতে পারেনি। যার কারণে তিনি একজন সরকারী চাকরিজীবি থেকে হয়েছেন সফল উদ্যোক্তা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। এ কে খান কত সালে জন্মগ্রহন করেন?

ক) ১৯০০ সালে খ) ১৯০৫ সালে

গ) ১৯০২ সালে ঘ) ১৯০৩ সালে

২। এ কে খানের বাবার নাম কী ছিল?

ক) আব্দুল লতিফ খান খ) আব্দস সালাম

গ) আব্দল গণি ঘ) রহিম শেখ

৩। এ কে খান সমাজ সেবক হিসাবে কাজ করে যে প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন তার নাম–

i) চট্রগ্রাম চক্ষু কমপে- ক্স ii) এ কে খান ফাউন্ডেশন

iii) চট্রগ্রাম চারুকলা কলেজ iv) শিশু হাসপাতাল ও আট গ্যালারী

নিচের কোন্‌টি সঠিক ঃ-

(ক) i খ) i ও ii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii, iii ও iv

৪। এ কে খানের চাকরী জীবনে অফিসে পদের নাম কী ছিল?

i) উকিল ii) হিসাব রক্ষক

iii) মুনসেফ iv) পিয়ন

নিচের কোন্‌টি সঠিকঃ

(ক) iii খ) i ও ii (গ) i ও iii (ঘ) i, iv

পাঠ-১২.৫ সফল উদ্যোক্তাদের জীবনী-৪

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- সফল উদ্যোক্তাদের জীবনী-৪ সম্পর্কে বিস্ড়রিত ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

জনাব রনদা প্রসাদ সাহা-এর জীবন ভিত্তিক কেস স্টাডি

জন্ম পরিচয় ঃ রনদা প্রসাদ সাহা বাংলাদেশের একটি সাধারণ সাহা বা পোদ্যার পরিবারে ১৮৯৮ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পৈত্রিক নিবাস টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে। তাঁর পিতা দেবেন্দ্র পোদ্দার একজন ছোট ব্যাবসায়ী ছিলেন। ব্যবসায়ের প্রতি অনাগ্রহ জন্মাবার আশঙ্কায় তখনকার দিনে পোদ্যার পরিবারে ছেলেদের বেশী লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়া হতো না। যে কারণে রনদা প্রসাদ নিম্ন প্রাইমারির অধিক শিক্ষালাভ করতে পারেন নি।

সৈনিক জীবন ঃ ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে রনদা বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে যুদ্ধে নাম লেখান এবং তাঁকে তখন 'বেঙ্গল অ্যাম্বুলেন্স কোরে' পুরুষ নার্স হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। মেসোপটেমিয়ায় যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি তাঁর স্বীয় প্রচেষ্টায় কয়েকজন আহত সৈনিকের প্রাণ রক্ষা করেন। এ কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ইংল্যান্ডের সম্রাটের সঙ্গে তাঁর করমর্দন করার সৌভাগ্য হয় এবং যুদ্ধের ভেটার্ন হিসেবে তাঁকে রেলের টিকিট কালেকটরের চাকরিকে নিয়োজিত করা হয়। অবশ্য এ চাকরি তিনি বেশি দিন করেননি। ১৯৩২ সারে তিনি এ চাকরি ছেড়ে দেন।

ব্যবসায় জীবনের ঘটনাপ্রবাহ ঃ চাকরি জীবনের অবসানের পর কলকাতায় তিনি কয়লার ব্যবসা শুরু করেন। সে সময় তিনি একদিন লক্ষ করলেন, তাঁর একজন খরিদ্দার লঞ্চের মালিক বেশ কিছুনি যাবৎ কয়লার দাম পরিশোধ করছেনা। উক্ত খরিদ্দারের কর্মচারীর নিকট তিনি জানতে পারলেন যে, তার ব্যবসা ভাল যাচ্ছেনা এবং সে লঞ্চখানা বিক্রয় করার জন্য খরিদ্দার খঁজছেন। রনদা এ সুযোগে তাঁর বাঁকি টাকা আদায় ও স্বল্পমূল্যে লঞ্চটি কিনলেন। লঞ্চখানা ছিল পুরাতন্ তাই প্রায়ই তা সারাবার জন্য তাঁকে ডকইয়ার্ডে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হতো। তখন তিনি চিন্তা করলেন যে, যদি নিজের ডকইয়ার্ড বানানো যায় তাহলে নিজের লঞ্চের মেরামত কাজও চলবে সে সাথে অন্যান্য মালিকের কাজ করে অর্থ উপার্জন করা যাবে। এভাবে কয়লা হতে লঞ্চ এবং লঞ্চ হতে ডকইয়ার্ড একে একে তাঁর ব্যবসায়ের অর্ন্তভুক্ত হল। পরবর্তীতে এ ব্যবসায়ের প্রচুর অর্থের প্রয়োজন মেটাতে রনদা কয়েকজন বিত্তশালী অংশীদার নিয়ে 'বেঙ্গল রিভার সার্ভিস কোম্পাণি চালু করে সেখানে সহযোগী হিসেবে কাজ করতে থাকেন। এক সময় কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালকের মৃত্যু হলে অন্যান্য অংশীদার ঝুঁকি নিতে রাজি হলেন না। তিনি তাদের প্রাপ্য অর্থ পরিশোধ করে নিজে ঝুঁকি গ্রহনের অদম্য সাহস ও মানসিকতা নিয়ে এ কোম্পানির মালিক হন। ১৯৩৯ সালের শেষদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ইংরেজ সরকার তাদের সেনাবাহিনী ও বেসামরিক প্রশাসনের জন্য বাংলাদেশ ও তার পাশ্ববর্তী এলাকা থেকে প্রচুর খাদ্যশস্য ক্রয়ের পরিকল্পনা গ্রহন করে। তৎকালীন খাদ্যমন্ত্রি হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দির হাতে রনদা প্রসাদ সাহার পরিচয় থাকায় সেসময় সরকারের সঙ্গে খাদ্যশষ্য ক্রয় করার জন্য চারজন এজেন্টের মধ্যে তাঁর নামও অর্ন্তভুক্ত হয়। এ ব্যবসায় রনদা প্রসাদ সাহা অনেক লাভবান হলেন এবং ১৯৪৪ সালের মধ্যে রনদা প্রসাদ সাহার অর্জিত মুলধনের পরিমাণ কয়েক লাখে গিয়ে দাঁড়ায়। এ টাকা তাঁর মানসিক অবস্থার পরিবর্তন আনে। নিজের বাল্যকালে বিনা চিকিৎসায় মাতার মৃত্যু যুদ্ধকালে সৈনিকদের দুঃসহ অবস্থা স্মরণ করে জীবন সম্পর্কে তাঁর মনে এক অদ্ভুদ চেতনার উদয় হয়। তিনি ঠিক করলেন নিজ গ্রামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করবেন এবং নিজের ছেলেমেয়েদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলবেন। সেই লক্ষ্যে ১৯৪৪ সালে রনদা প্রসাদ মির্জাপুরের ভুতুড়ে খাল বলে পরিচিত এলাকায় ৫০ শয্যার একটি হাসপাতাল এবং একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন।এ সময় নারায়নগঞ্জের অতি প্রাচীন পাট ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান 'র্জজ এন্ডারসন কোম্পানি' তাদের পাটের ব্যবসায় তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলে রনদা সাহা এ সুযোগ হাতছাড়া না করে উক্ত পাটের ব্যবসায় ক্রয় করেন। বেঙ্গল রিভার সার্ভিস কোম্পানির সাথে সাথে নারায়নগঞ্জের পাটের বেইলিং, ভাড়া দেওয়ার জন্য পাটের গুদাম ও একটি ডকইয়ার্ড চালু করেন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্ব মুহুর্তে তাঁর মোট মূলধনের পরিমান প্রায় দু'কোটি টাকায় এসে দাঁড়ায়।

সেবামূলক প্রতিষ্ঠানসমুহ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষপর্যায়ে রনদা সাহা তাঁর সম্পুর্ণ ব্যবসায় থেকে যে আয় হতো তা দ্বারা পরিচালিত একটি দাতব্য ট্রাস্ট গঠন করেন যা 'কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট' নামে পরিচিত। মির্জাপুরের কুমুদিনী হাসপাতাল, ভারতেশ্বরী হোমস, কুমুদিনী হাসপাতাল স্কুল অব নার্সিং, টাঙ্গাইলের কুমুদিনী কলেজ ও এস কে হাই স্কুল এবং মানিকগঞ্জের দেবেন্দ্র কলেজ তিনিই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এসব প্রতিষ্ঠান ট্রাস্টের আয় দিয়েই পরিচালিত হতো। রনদা সাহা তাঁর উপার্জিত অর্থ নিজের ভোগবিলাসে ব্যয় না করে সর্বস্ব মানবতার সেবায় উৎসর্গ করেন।

সাফল্যের পেছনে কারণসমুহ

একজন সফল ব্যবসায়ী হিসেবে রনদা প্রসাদ সাহার চরিত্রে যে গুণগুলো ছিল, তন্মধ্যে সংগঠন, যোগ্যতা, দুরদর্শিতা, ঝুঁকি গ্রহণের সাহস, গভীর আত্মপ্রত্যয় ও সুযোগের সদ্ব্যবহার অন্যতম। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন অমায়িক, বন্ধুসুলভ, দানশীল ও সমাজসেবী। আর্তমানবতার সেবায় তিনি ছিলেন নিবেদিত প্রাণ।

গ্রেফতার ও নিখোঁজ

মাতৃভুমির সেবার জন্য রনদা ছিলেন দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। যে কারণে পাকিস্তান সৃষ্টির পর বিত্তশালী হিন্দুরা অনেকেই ভারতে চলে গেলেও তিনি মাতৃভূমি ত্যাগ করেননি। কিন্তু অত্যন্ত দূর্ভাগ্যজনকভাবে ১৯৭১ সালের ৭ মে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সেনারা তাঁকে এবং তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র ভবনী সাহাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। পরে তাদের আর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।

সারসংক্ষেপ

রনদা প্রসাদ সাহা সফল ব্যবসায়ী এবং মানবতার সেবক হিসেবে যে অদর্শ আমাদের সামনে রেখে গেছেন তা দেশবাসী চিরদিন কৃতজ্ঞতার সাথে স্বরণ রাখবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। রনদা প্রসাদ সাহার জন্ম-
ক) ১৯০৮ সালে খ) ১৮৯৮ সালে
গ) ১৮১৮ সালে ঘ) ১৯১৮ সালে

২। রনদা প্রসাদ সাহার পিতার নাম কী ছিল?
ক) বিনদা প্রশাদ সাহ খ) অনিল পোদ্যার
গ) দেবেন্দ্র পোদ্যার ঘ) সুরঞ্জিত পোদ্যার

৩। রনদা প্রসাদ (আর পি সাহা) সাহার জীবনীতে লক্ষ করা যায়-
i) তিনি সাধারন পরিবারে জন্ম নেন
ii) স্বীয় উদ্যোগ প্রচেষ্ঠা বলে তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন
iii) প্রাইমারীর অধিক শিক্ষা পাননি
নিচের কোন্‌টি সঠিকঃ
(ক) i খ) i ও ii (গ) i ও iii (ঘ) iii ও iii

৪। রনদা প্রসাদ সাহা অংশীদারদের নিয়ে বেঙ্গল রিভার সার্ভিস কোং চালু কারার কারন কী?
i) ব্যবসায় উদোগ গ্রহণের জন্য

ii) ব্যবসায় কার্যাবলী প্রসারের জন্যে
iii) ব্যবসায় মূলধনের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য
নিচের কোন্‌টি সঠিকঃ
(ক) i খ) i ও ii (গ) iii (ঘ) i ও ii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৫-৬ নং প্রশ্নের উত্তর দিন:

২য় বিশ্ব যুদ্ধ শুরু হলে জাপানিরা মিয়ানমার দখল করে নেয়। মিয়ানমার চাউলের জন্য ইংরেজদের প্রধান ভরসা। তাই মিয়ানমার হাত ছারা হওয়ার পর তারা সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসনের খাতিয়ে প্রচুর চাউল কেনার পরিকল্পনা গ্রহন করে। সরকারী চাউল কেনার জন্য চারজন ডিলার নিয়োগ করেন আরপি সাহা তাদের মধ্যে একজন।

৫। ২য় বিশ্ব যুদ্ধ শুরু হয়-
ক) ১৯১১ সাল খ) ১৯১৪ সাল
গ) ১৯৩৯ সাল ঘ) ১৯৪৫ সাল

৬। আরপি সাহা ছাড়া আর কয়জন ডিলার ছিলেন?
ক) ৪ জন খ) ৩ জন
গ) ২ জন ঘ) ১ জন

পাঠ-১২.৬ সফল উদ্যোক্তাদের জীবনী-৫

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- সফল উদ্যোক্তাদের জীবনী-৫ সম্পর্কে বলতে পারবেন।

জনাব হাজী মোহাম্মাদ জুনাব আলী সাহেবে-এর জীবন ভিত্তিক কেস স্টাডি

জন্ম পরিচয় ঃ ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে কুমিল্লা জেলার অর্ন্তগত নিমসার গ্রামে জুনাব আলী জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা শেখ চারু মিয়া ছিলেন একজন সাধারণ ধর্মপরায়ণ কৃষক। জমিজমা বলতে কিছুই ছিলনা। অধিকাংশ সময় সংসার খরচের জন্য নিকট আত্মীয়স্বজনদের কাছে সাহায্যের জন্য ধরনা দিতে হতো। এভাবে আর্থিক অনটনের মধ্যে জীবনযাপনের একসময় শেখ চারু মিয়া ১৯৪৪ সালে ৮২ বছর বয়সে তাঁর নিজ গ্রামে ইন্তিকাল করেন।

শিক্ষাজীবন ঃ হাজি জুনাব আলীর কর্মজীবনের কাহিনী অন্যান্য ব্যবসায়ীর জীবন বৃত্তান্ত থেকে কিছুটা ভিন্ন আঙ্গিকের। তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয় নিজ গ্রামের মক্তবে। এক বছর পর তিনি যখন প্রথম থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উর্ত্তীন হন, তখন পিতার নিকট নতুন বই কেনার জন্য কিছু টাকা চান। কিন্তু তাঁর পিতা টাকা না দিতে পারায় ঘরে চাল যা ছিল সব বিক্রি করে এক টাকা ৫৬ পয়সা পেলেন এবং তা নিয়েই বাড়ী ত্যাগ করলেন এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন যে পর্যন্ত নিজে প্রতিষ্ঠিত হতে না পারবেন এবং বাবা-মার ভরন পোষণের ব্যবস্থা করতে না পারবেন সে পর্যন্ত বাড়ি ফিরবেন না। সেই এক টাকা ৫৬ পয়সাই ছিল তাঁর বাস্তব জীবনের সোপান।

ঘটনাবহুল ব্যবসায়িক জীবন ঃ এক টাকা ৫৬ পয়সা দিয়ে তিনি তরিতরকারী বিক্রয় করতে শুরু করেন। সুদীর্ঘ বারো বছর তিনি এ ব্যবসায় জড়িত ছিলেন। এ ব্যবসায় থেকেই ক্রমান্বয়ে সঞ্চিত মুলধন তিন হাজার উন্নিত করলেন এবং তা দিয়ে কুমিল্লা জেলার পশ্চিমে ময়নামতি বাজারে একটি বড় আকারের মনিহারি দোকান দিলেন।

১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর ঘাঁটি ছিল ময়নামতি। জুনাব আলী যুদ্ধ চলাকালিন সেনা নিবাসে নিয়মিত চাল, ডাল, তেল ইত্যাদি সরবরাহের কন্ট্রাক্ট পান এবং তা থেকে প্রায় বিশ হাজার টাকা উপার্জন করেন।

১৯৪৫ সালে যুদ্ধ যখন শেষপর্যায়ে সেই সময় তিনি এ টাকা দিয়ে কুমিল্লা শহরের ব্যস্ততম এলাকা শাসনগাছায় একটি বড় আকারের মনিহারি দোকান দেন। শাসনগাছায় তখন মাত্র দুটি দোকান থাকার কারণে তার ব্যবসায় ছিল খুবই জমজমাট। কিছুদিন পর তিনি দোকান থেকে মুলধন উঠিয়ে কুমিল্লা দাউদকান্দি রুটে 'সোনার বাংলা' এবং 'গ্রীন এ্যারো' নামক বিশ হাজার টাকা মূল্যের দুটি বাস চালু করেন। একাধিক পণ্য নিয়ে ব্যবসায় পরিচালনা করলে স্থায়ী ব্যয় কম হবে ভেবে তিনি ১৯৫০ সালে তাঁর শামনগাছায় দোকানের নামে তৎকালীন পাকিস্তান টোবাকো কোম্পানির কুমিল্লা জেলার একমাত্র পরিবেশক হন। ট্রান্সপোর্ট ব্যবসায় লাভজনক ছিল বলে তিনি এ ব্যবসায়েও মূলধন নিয়োগ করেন এবং প্রায় প্রতি বছরই দু একটি করে বাস বা ট্রাক ক্রয় করতেন এ ব্যবসায়ের প্রয়োজনীয় মুলধনের ৩০% তিনি জনতা ব্যাংক থেকে গ্রহন করতেন। এ সময়ে তিনি কুমিল্লা শহরের আবাসিক এলাকা অশোকতলা এবং কান্দিরপাড়ে দুটি হিন্দু জমিদারের বাড়ি ক্রয় করেন। তাছাড়া ১৯৪৭ সালে অনেক হিন্দুই দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় জুনাব আলী তাদের জমি ধন সম্পত্তি ক্রয় করে সম্পদশালী হন। জুনাব আলী নিজে রেইস কোর্স এলাকায় একটি খালি জায়গা ক্রয় করে বাড়ি করেন। এ সময় এ জমিতে তাঁর ট্রান্সপোর্টের তত্ত্বাবধানের জন্য পুত্র নুরল ইসলামের নামে নুর ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কসপ স্থাপন করেন। ১৯৬৮ সাল পর্যন্ড় তার মোট বাস সংখ্যা দাঁড়ায় ৭০টিতে এবং এ ব্যবসায় তাঁর প্রায় দুশো শ্রমিক নিয়োজিত ছিল। ইতোমধ্যে গ্রামের রাজনীতিতে জুনাব আলী ক্রমশ জড়িয়ে পড়েন। সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে তৎকালীন কৃষক-শ্রমিক আওয়ামীলীগের তিনি একজন সমর্থক থাকায় জুনাব আলী স্থানীয় প্রতি নির্বাচনেই জয়লাভ করতেন এবং প্রায় একটানা ৩০ বছর যাবৎ ইউনিয়ন বোর্ডের কখনও মেম্বার বা কখনো প্রেসিডেন্ট ছিলেন। রাজনৈতিক কারণেই ১৯৫৮ সালে তাঁকে নিজ বাসভবন থেকে গ্রেফতার করা হয় এবং সাত দিন কারাবরণ করতে হয়। ১৯৬২ সালে জুনাব আলী খাদ্য মন্ত্রণালয় থেকে আলুর বীজ আমদানির একটি লাইসেন্স সংগ্রহ করেন। আমদানি ব্যবসায় শুরুর পর থেকে ১৯৭০ সালের মধ্যে মূলধন প্রায় ২৫/৩০ লাখ টাকায় উন্নীত করেন। ১৯৬৮ সাল থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত তিনি খাদ্য মন্ত্রনালয়ের অধীনে খাদ্য পরিবহন ঠিকাদার

নিযুক্ত ছিলেন। আবার এসময়ে চট্রগ্রাম বিভাগের পাকিস্তান টোবাকো কোম্পানির ঠিকাদারও ছিলেন তিনি। চট্রগ্রাম থাকাকালীন ১৯৬৮ সালে ব্যস্ততম বাণিজ্যিক এলাকা আগ্রাবাদে এক বিঘার একটি খালি জায়গা ক্রয় করেন এবং ব্যবসায়িক কাজকর্মের সুবিধার জন্য সেখানে একটি বাড়ি নির্মাণ করেন। বার্মা ইস্টার্ণের এজেন্সি নিয়ে ১৯৭০ সালে ঢাকা-চট্রগ্রাম সড়কের পাশে ময়নামতিতে ৫ বিঘা জমির উপর ৫ লাখ টাকা ব্যয়ে একটি পেট্রোল পাম্প স্থাপন করেন। হাজি জুনাব আলী ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় শহর ছেড়ে নিজ গ্রামে ফিরে যান এবং সেখানে ১ বছর সময় অতিবাহিত করেন। যুদ্ধ চলাকালিন সময়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী তাঁর প্রায় ২০/৩০টি বাস ট্রাক ধ্বংস করে। বাকি বাস ও ট্রাক তাঁর কেন্দ্রিয় ওয়ার্কশপে বন্ধ রেখে তিনি সে সময়ে গ্রামের জমিজমার দিকে মনোনিবেশ করেন এবং অল্প সময়ের ভেতরে চাষের উপযোগী জমির পরিমান বৃদ্ধি করেন। সরকার ১৯৭২ সালে আলু আমদানি সরকারী নিয়ন্ত্রনে নিয়ে আসে। সরকারের এ সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে জুনাব আলী ১৯৭২ সালে জানুয়ারী মাসে আলু গুদামজাত করার জন্য পঞ্চাশ হাজার মণ আলু রাখার ক্ষমতাসম্পন্ন একটি হিমাগার স্থাপন করেন। এখানে লক্ষণীয় বিষয় জুনাব আলী সুযোগ বুঝে বহু নতুন ব্যবসায় বা শিল্প বিনিয়োগ করেছেন এবং অলাভজনক মনে হলে পুরাতন কাজ ধীরে ধীরে পরিত্যাগ করেছেন। বেতকা হিমাগার শিল্পে মোট ব্যয় হয় ২০ লাখ টাকা, তাঁর নিজস্ব বিনিয়োগ ৬ লাখ টাকা এবং ১৪ লাখ টাকা ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছিলেন। জনাব আলী ১৯৭৪ সালে মুন্সিগঞ্জের কমলাঘাট 'প্রজেক্ট' ট্রেডিং স্টোরেজ লিমিটেডের শতকরা ৬০ ভাগ শেয়ার ক্রয় করেন এবং নগদ ১০ লাখ টাকা বিনিয়োগ করেন। এছাড়া জুনাব আলী ১৯৭৬ সালে কুমিল□া শহর থেক দক্ষিন-পুর্ব কোণে শামস কোল্ড স্টোরেজ লিঃ এর শতকরা ৫০ ভাগ শেয়ার ১৮ লাখ টাকার বিনিময়ে ক্রয় করেন। ব্যাংকের সহায়তায় আবার ১৯৭৮ সালে মুন্সিগঞ্জের বেতকায় জামাল আইস এন্ড কোল্ড সোটারেজ লিঃ এ ৩৫ লাখ টাকা বিনিয়োগ করেন। এর দুই তৃতীয়াংশ অর্থ জুনাব আলীর ছিল। কুমিল-া শহরের সাত মাইল পশ্চিমে কাবিলী নামক স্থানে একটি ব্রিকফিল্ডও স্থাপন করেন। ব্রিকফিল্ড ইট মূলত তাঁর নিজের র্নিমাণ কাজেই ব্যবহার করা হয়। তিনি ১৯৬২ সালে ঢাকার মালিবাগে ৫ কাঠা জমির উপর একটি দোতলা বাড়ি নির্মাণ করেন। জনাব জুনাব আলী মালিবাগ ডি আই টি রোডের পাশে ৮ কাঠা জমির উপর স মিলস স্থাপন করে কাঠের ব্যবসায় শুরু করেন। এছাড়া ১৯৭৫ সালে ঢাকার খিলগাঁয়ে চার কাঠার একখন্ড জমি ক্রয় করেন।

জুনাব আলী আরও একটি হিমাগার ১৯৮০ সালে কুমিল্লা শহর থেকে ৮ মাইল পশ্চিমে মোকাস নামক স্থানে ১ লাখ মণ আলু রাখার ক্ষমতাসম্পন্ন 'মোকাস স্টোরেজ লিঃ' নামে প্রতিষ্টা করেন। বিভিন্ন হিমাগারে ১০০ জন লোকের কর্মসংস্থান হয় এবং এখানে তাঁর নিজস্ব বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ৫০ লাখ টাকা। বাঁকি ৫০ লাখ টাকা তিনি ব্যাংক থেকে ঋণ নেন এবং প্রধান ব্যবসায়িক হিসেবে সাফল্য মূলত হিমাগার স্থাপনের মাধ্যমেই অর্জিত হয়।

সারসংক্ষেপ

আলহাজ্ব মোহাম্মাদ জুনাব আলী তাঁর কর্মগুণে আজ ব্যবসায়ীদের নিকট আদর্শ ও প্রেরণার জ্বলন্ত উদাহরণ। তিনি প্রমাণ করে গেছেন পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার কাছে কোনো কিছুই অসম্ভব নয়। তার একনিষ্টতা, সততা, পরিশ্রম তাঁকে এ শীর্ষ অবস্থানে এনেছে। তিনি নামমাত্র পুঁজি নিয়ে ব্যবসায়ের মাধ্যমে অগাধ সম্পত্তির মালিক হয়েছেন। তার এই কর্মকান্ড সৃজনশীল উদ্যোক্তাদেরকে উদ্যোগ কার্যক্রমে ব্যাপক অনুপ্রাণিত করবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। জনাব হাজী মোহাম্মদ জুনাব আলী কোন জেলায় জন্ম গ্রহন করেন?
ক) টাঙ্গাইল জেলা খ) কুমিল-া জেলা
গ) নরসিংদী জেলা ঘ) মুন্সীগঞ্জ

২। জনাব হাজী মোহাম্মদ জুনাব আলী কত সালে জন্ম গ্রহণ করেন?
ক) ১৯১৬ সালে খ) ১৯২০ সালে
গ) ১৯১৫ সালে ঘ) ১৯১৮ সালে

৩। জনাব হাজী মোহাম্মদ জুনাব আলী কুমিল-া জেলার ময়নামতি বাজারে কিশের দোকান দেন?
ক) ঔষধের দোকান খ) কাপড়ের দোকান
গ) মনিহারি দোকান ঘ) চালের দোকান

৪। জনাব হাজী মোহাম্মদ জুনাব আলী কত সালে পাকিস্তান টোবাকো কোম্পানির পরিবেশক হন?
ক) ১৯৪৮ সাল খ) ১৯১৫ সাল
গ) ১৯৪৫ সাল ঘ) ১৯৫২ সাল

৫। ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত জনাব হাজী মোহাম্মদ জুনাব আলী মোট বাসের সংখ্যা কত ছিল?
ক) ৭০ টি খ) ৬৫ টি
গ) ৬৮ টি ঘ) ৭২ টি

৬। জনাব হাজী মোহাম্মদ জুনাব আলী একটানা কত বছর ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বার বা প্রেসিডেন্ট ছিলেন
ক) ৩০ বছর খ) ২৫ বছর
গ) ২০ বছর ঘ) ২৮ বছর

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ ১

উদ্যোক্তা শিল্প বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কান্ডারী। বাংলাদেশের অন্যতম সকল উদ্যোক্তা হচ্ছে জনাব জহুরুল ইসলাম। ব্যবসায় প্রতিভা কঠোর পরিশ্রম দুরদর্শিতা ও সৃজনশিলতার সম্মন্বয়ে গঠিত মানুষটি স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের শিল্প বাণিজ্য জগতে একটি অতি পরিচিত নাম। তিনি ১৯২৮ সালে কিশোরগঞ্জ জেলার বাজিতপুর উপজেলায় ভাগলপুর গ্রামে জন্ম গ্রহন করেন। "পরিশ্রমী ও প্রতিভাকে অগ্রাহ্য করে" এ সত্যটিই প্রমাণ করলেন বাংলাদেশের কিংবদন্তী সফল উদ্যোক্তা জহুরুল ইসলাম। সামান্য লেখাপড়া শিখে কঠোর পরিশ্রম আর আত্মবিশ্বাস পুঁজি করে তিনি একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী থেকে দেশের দীর্ঘ স্থানীয় ব্যবসায়ীদের কাতারে পৌছাতে সফল হয়েছিলেন।

ক) উদ্যোক্তা কাকে বলে ?
খ) উদ্যোক্তার দুটি কাজের বর্ণনা দিন ?
গ) একজন সকল উদ্যোক্তা হিসাবে জহুরুল ইসলামের কি কি গুণ ছিল বলে তুমি মনে করেন ?
ঘ) একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে জহুরুল ইসলামের মত উদ্যোক্তার ভূমিকা বিশ্লেষণ করুন।

সৃজনশীল প্রশ্নঃ ২

জহুর"ল ইসলাম বাংলাদেশের শিল্প উদ্যোক্তাদের মধ্যে একটি বিশেষ পরিচিত নাম। উদ্যোক্তা হিসাবে জহুরুল ইসলাম যে সমস্ড় গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন তন্মধ্যে পরিশ্রম, সততা, নিষ্ঠা এবং গুণগত মানের কারণে দুই বছরের মধ্যেই ১৯৫৩ সালে তিনি পর্যায়ক্রমে দ্বিতীয় ও প্রথম শ্রেণীর ঠিকাদার হিসাবে পরিণত হন। সকলের নিকট বিশ্বস্ত থাকার ফলে তিনি বাকিতে যে কোন পরিমাণ মাল আর করতে পারতেন একজন সমাজ সংস্কারক, সকল সংগঠক, ব্যবস্থাপকের মডেল তিনি। তাই অতি সাধারণ মানুষ ও যে তার সততা ও কর্মদক্ষতার গুণে বিশেষ্ট ব্যক্তিত্বে পরিণত হতে পারেন জহুরুল ইসলাম তার বড় প্রমাণ।

ক) শিল্প উদ্যোক্তা কীভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করে ?
খ) উদ্ভাবনী শক্তি উদ্যোক্তার কী ধরনের গুণ ব্যাখ্যা করুন ?
গ) জহুরুল ইসলামকে কেন ব্যবসায়ীরা সাহায্য সহযোগীতা করত এবং কেন তাকে সমাজ সংস্কারক বলা হত ?
ঘ) বাংলাদেশের জন্য জহুরুল ইসলামের মতো উদ্যোক্তার প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১২.২ : ১. গ ২. খ ৩. ঘ ৪. ঘ ৫. খ ৬. ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১২.৩ : ১. গ ২. খ ৩. ঘ ৪. ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১২.৪ : ১. খ ২. ক ৩. ঘ ৪. ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১২.৫ : ১. খ ২. গ ৩. গ ৪. গ ৫.ঘ ৬. খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১২.৬ : ১. খ ২. ক ৩. গ ৪. খ ৫.ক ৬. ক